Vol. 41 | No. 2 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের চিত্তনামা : ভাবলোক ও শিল্পরূপ

Volume	41
Issue	2
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু হেনা আবদুল আউয়াল
Published online	February 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v41i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i2.1
Pages	5-24
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

নজরুলের চিত্তনামা ঃ ভাবলোক ও শিল্পরূপ

Check for updates

আবু হেনা আবদুল আউয়াল

ভূমিকা

তৎকালীন বঙ্গ ভারতীয় রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) ছিলেন উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী জননেতা। ১৯১৭ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি রাজনীতিতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। জনগণ তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। মন্টেগু-চেমসফোর্ড কমিশন (১৯১৮), রাউলাট এ্যাক্ট (১৯১৯), জালিওয়ানাবাগ গণহত্যা (১৯১৯) প্রভৃতির বিরুদ্ধেই তিনি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯১৯ সালে তিনি সর্ব প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিক আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাভোগ করেন। ১৯২০-২১ সালের মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) পরিচালিত খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বৃটিশ সরকার ১৯২১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে পীড়ন নীতি প্রয়োগ করতে শুরু করে। এ সময় অন্যান্য নেতা ও সহকর্মীর সংগে চিত্তরঞ্জন দাশকে কারারুদ্ধ করা হয় (১০ ডিসেম্বর) এবং তাঁকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। ভারতের সর্বত্র ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হয়। ফলে আন্দোলনও হিংস্র রূপ পরিগ্রহ করে। এতে মহাত্মা গান্ধী মর্মাহত হয়ে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধের প্রস্তাব করলে কংগ্রেস তা বন্ধ করে দেয় (২৫ ফেব্রুয়ারি)। পরে কংগ্রেসের আপোষমূলক নীতির প্রতিবাদে চিত্তরঞ্জন দাশ অধিকতর বিপ্লবী দল – 'স্বরাজ্য দল' (১ জানুয়ারি, ১৯২৩) গঠন করেন।

তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতায় এ দল ১৯২৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গ প্রদেশে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করে। তাঁর উদ্যোগে এ সময় হিন্দু-মুসলমান মিলনের সামাজিক, নাগরিক, ধর্মীয় সম-অধিকার অর্জনের চুক্তি – 'ন্যাশনাল বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) স্বাক্ষরিত হয়। অবশ্য উগ্রপন্থী হিন্দু ও মুসলমান এর বিরোধিতা করে।

রাজনৈতিক নেতা ছাড়াও তিনি ছিলেন কবি, লেখক, গীতিকার ও সম্পাদক। তিনি 'নারায়ণ', 'বাংলার কথা' ও 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদনা বা পরিচালনা করতেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় করাচী-ফেরত কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-

---

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ফুলগাজি সরকারি কলেজ, ফেনি

১৯৭৬) পরিচয় ঘটে এবং দিনে দিনে সেই পরিচয় গাঢ় হয়। এ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন দাশের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণী দেবীর মন্তব্য স্মর্তব্য, "…. কাজী নজরুল ইসলাম— বাবার বিশেষ অনুগত ছিলেন —ভক্তও ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতেন।" (সুধীর কুমার মৈত্র, ১৯৯২ : ১০৩)।

১৯২০ সালের এপ্রিল–মে মাস থেকে 'মোসলেম ভারত' (১৯২০) পত্রিকায় নজরুলের 'বাঁধন হারা' (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯২৭) উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকলে 'নারায়ণ' পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় এর প্রশংসা করা হয় (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ১৯৮৩ : ৫–৬)। ১৯২১–২ সালে এ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় নজরুলের এগারটি কবিতা ও গান প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম, ১৯৬৯ : ১০–১৯)। ১৯২১ সালে নারায়ণের কার্তিক সংখ্যায় (১৩২৭) তাঁর 'খেয়াপারের তরণী' ও 'বাদল বরিষণে'র প্রশংসা করা হয় (মুস্তফা নূরউল ইসলাম, ১৯৮৩ : ৫)। এ ছাড়া ১৯২২ সালে নজরুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হলেও নারায়ণ পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩২৯) উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসহ পরিচিতি ছাপানো হয় (মুস্তফা নূরউল ইসলাম, ১৯৮৩ : ৯)।

১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জ জেলে থাকাকালে (ডিসেম্বর) তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী 'বাংলার কথা'র জন্যে কবিতা চাইতে নজরুলের কাছে পাঠিয়েছিলেন দাশ পরিবারের সদস্য শ্রীসুকুমার দাশকে। নজরুল তাঁকে বসিয়ে রেখে সেই মুহূর্তে লিখে দেন 'ভাঙার গান'। ১৯২২ সালের ২০ জানুয়ারি এ পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। বাসন্তী দেবী নজরুলকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণও করেন এবং নজরুল তাঁর বাড়িতে যান (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ৭৩)

'ধূমকেতু'তে (১৯২২) প্রকাশিত (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২) 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় নজরুল সদ্যকারামুক্ত (জুন, ১৯২২) চিত্তরঞ্জনের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে সমালোচনা করেন। অবশ্য এর পরে ৭ নভেম্বর ধূমকেতুতে 'প্রকৃত স্বরাজ' নামে চিত্তরঞ্জনের একটি ভাষ্য গুরুত্বসহ প্রকাশ করা হয় (সুধীর কুমার মৈত্র, ১৯৯২ : ১০২)।

হুগলি জেলে রাজবন্দীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৯২৩ সালের ১৪ এপ্রিল হতে নজরুল ঐ জেলে অনশন শুরু করেন এবং অনেকদিন অব্যাহত রাখেন। ফলে দেশে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে (গোলদীঘির ময়দান ২১ মে) চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় শ্রীমৃনালকান্তি বসু, মাওলানা মোহাম্মদ

মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, শ্রীহেমন্তকুমার সরকার ও শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন প্রমুখ নজরুলের প্রশংসামূলক বক্তৃতা করেন। এসব বক্তার মতো চিত্তরঞ্জন তাঁর বক্তৃতায় নজরুলের প্রশংসাকীর্তন করে অনেক কথা বলেন। সভায় জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের তীব্র নিন্দা ও ডঃ সরওয়ার্দিকে (ডঃ আবদুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দি) বন্দীদের অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জ্ঞাপনের দায়িত্ব দেবার প্রস্তাব করা হয়। সোহরাওয়ার্দি সে দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করেন। ফলে বন্দীরা আহার গ্রহণে সম্মত হন (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ১৯৮৩ :৩৪-৩৬)।

১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২৩ জ্যৈষ্ঠ থেকে চিত্তরঞ্জন তারকেশ্বরের দুর্নীতিপরায়ণ অসচ্চরিত্র ধর্মব্যবসায়ী মোহান্তকে তাড়াবার জন্যে আন্দোলন শুরু করলে নজরুলও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন এবং প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। এ উপলক্ষে তিনি 'মোহান্তের মোহ অন্তের গান' রচনা করেন (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯০ : ১০৬)।

১৯২৫ সালের মে মাসে ফরিদপুরে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। নজরুল তাঁর সঙ্গীসহ (আবদুল হালিম) মনীন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ঐ অধিবেশনে যোগ দেন। তিনি তাতে বক্তৃতা করেন ও গান পরিবেশন করেন (বন্দে আলী মিয়া, ১৯৭১ :২৬৭-৭১)।

এর পরের মাসে ১৬ জুন দার্জিলিং-এ চিত্তরঞ্জন দাশ অকালে মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হুগলিতে বাস করতেন। তাঁর একান্ত কাছের এ মহান নেতার অকাল প্রয়াণে তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্যা তাঁর 'শেষের কয়দিন' শীর্ষক নিবন্ধে লেখেন, "আমার আজও মনে আছে পিতৃদেব অন্তিম শয্যানে শায়িত —হঠাৎ কোথা থেকে অদ্ভুত প্রকৃতির এক যুবক অবিন্যস্ত তার কেশদাম – পরনে একটি বিচিত্র ধরনের পোষাক, ঝড়ের বেগের মত ছুটে এলেন —হাতে এক টুকরা কাগজ। কাহাকে কিছু না বলে সেই কাগজের টুকরাতে লিখে শবদেহের উপর রাখলেন—

"হায় চিরভোলা হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া
ফিরিয়া এলে গো নীল-কণ্ঠে
মৃত্যু গরল পিয়া।"

ইনি সেই আমার ভ্রাতৃপ্রতিম কাজী নজরুল ইসলাম।" (সুধীর কুমার মৈত্র,১৯৯২ ১০২-৩)।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের গুরু, বন্ধু ও সাথী। তিনি অনুভব করলেন তাঁর মৃত্যুতে দেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। আশংকিত ও শোকাহত চিত্তে তিনি চিত্তরঞ্জনের আদর্শ, চেতনা, নেতৃত্ব ও কৃতিত্ব স্মরণ করে এবং একই সংগে শ্রদ্ধা নিবেদন করে একে একে লিখে চললেন 'অর্ঘ্য' (৩ আষাঢ়) 'অকাল সন্ধ্যা' (৬ আষাঢ়), 'ইন্দ্র-পতন' (১১ আষাঢ়),'সান্ত্বনা' (১৬ আষাঢ়) ও 'রাজ-ভিখারী' (১৭ আষাঢ়) মাত্র পনের দিনে এই পাঁচটি কবিতা ও গান তিনি রচনা করেন। শুধু রচনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি ; এগুলোর কোনোটি তিনি শবাধারবাহী মিছিলে ও কোনোটি শোকসভায় গেয়েছেন ও পড়েছেন (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ১১৩)। এ ছাড়া এগুলো তিনি সে সময় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেন (রফিকুল ইসলাম :১৯৯১ –১১৩)। তন্মধ্যে 'ইন্দ্র-পতন' কবিতাটি 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশের (১২ আষাঢ়) সংগে সংগে রক্ষণশীল মুসলিম পত্রিকা ও লেখকরা নজরুলকে অশোভন ভাষায় সমালোচনা করে (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ১৯৮৩ : ৬২-৬৩)। কারণ, কবি তাঁর এ কবিতায় মহান নেতার গুণ কীর্তন করতে গিয়ে তাঁকে নবীদের সাথে তুলনা করে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বলে ফেলেছিলেন, 'হে মানব আম্বিয়া।' তা ছাড়া কবিতাটিতে এমন আরো কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল, যা ইসলামি ভাব ধারার অনুকূল নয়। (চৌধুরী শামসুর রহমান – পঁচিশ বছর, পৃ. ৪২-৪৪, নজরুল রচনাবলী, পৃ. ৯০৩) যেমন —

জন্মিলে তুমি মোহাম্মদের আগে, হে পুরুষবর।
কোরানে ঘোষিত তোমার মহিমা হতে পয়গাম্বর।
যে জ্যোতি পারেনি সহিতে স্বয়ং মুসা ও কোহ্-ই-তুরে,
সেই জ্যোতি তুমি রেখেছিলে তব নয়ন-মণিতে পুরে। (ঐ)

অল্পকাল পরেই তিনি 'ইন্দ্র-পতন' কবিতাটিসহ চিত্তরঞ্জনের ওপর লিখিত উক্ত কবিতা ও গানের সংগে একত্রে করে 'চিত্তনামা (শ্রাবণ ১৩৩২) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

গ্রন্থভুক্ত করার সময়ে উপর্যুক্ত চার পঙ্ক্তি বাদ দেন এবং 'হে মানব আম্বিয়া'র পরিবর্তে লেখেন—'হে মানব নবী হিয়া'। অবশ্য এর পরও কবিতাটি ইসলামি ভাবধারার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি : কারণ, চিত্তরঞ্জনকে 'পয়গাম্বর', 'আউলিয়া' ও 'ইব্রাহিমে'র সংগে তুলনা এবং 'ফেরেশতা সব করিয়ে সালাম' অংশটুকু রয়ে গেছে। কবি আবেগের আতিশয্যে এ জাতীয় পঙ্ক্তি রচনা বা উপমা ব্যবহার করলেও সচেতনভাবেই করেছেন। এ সম্পর্কে অন্যত্র তাঁর উক্তি স্মর্তব্য, '... আমি শরীয়তের

বাণী বলিনি – আমি কবিতা লিখেছি। ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মও লাভ করতে পারে না। তার প্রমাণ – আরব দেশ।' (আন্ওয়ার হোসেনকে লিখিত পত্র, ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) নয় নং পত্র, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৩ : ৩৭১), অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁকে (১৮৯৪–১৯৭৮) লিখিত পত্রেও (নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৩ : ৩৯২) তাঁর এরকম অভিমত অভিব্যক্ত হয়েছে।

'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পর 'কল্লোল '(১৯২৩) পত্রিকায় লেখে (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) 'দেশবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, কবিতা বই' (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ১৯৮৩ : ৬৫)। এ কাব্যগ্রন্থটি তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে উৎসর্গ করেন। তাতে তিনি লেখেন , 'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রী শ্রী চরণারবিন্দে—নজরুল ইসলাম।' চিত্তরঞ্জনের বাসায় নজরুলের যাতায়াত ছিল এবং বাসন্তী দেবী তাঁকে স্নেহ করতেন। তারই স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে উৎসর্গ পত্রে (রফিকুল ইসলাম ১৯৯২ : ৭৩)।

চিত্তনামা কাব্য গ্রন্থটির নামকরণে ফার্সি সাহিত্যের কবি ফেরদৌসির (৯৩২–১০২০) 'শাহ্নামা'র প্রভাব কাজ করতে পারে। অবশ্য মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যেও অনেক 'নামা' কাব্যের নাম পাওয়া যায়। যেমন, 'নামাজনামা', 'তালিবনামা', 'নসীরানামা', 'নসিহতনামা','সরতনামা', 'আসহাবনামা', 'কিয়ামতনামা', 'সায়াতনামা', 'শরীয়তনামা', 'শিহাবুদ্দিননামা', 'শহরনামা', 'জঙ্গনামা', 'সিরনামা', 'নূরনামা' 'সিকান্দারনামা' প্রভৃতি। এগুলো থেকেও তিনি নামকরণের প্রেরণা পেতে পারেন।

চিত্তনামা কাব্য গ্রন্থটিতে নজরুল তাঁর শোকবিহ্বল চিত্তের আবেগঘন প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে কবির ব্যক্তিগত হাহাকার, দুঃখ, বেদনা, শোক ও আবেগ বাঙালির হাহাকার, দুঃখ, বেদনা, শোক ও আবেগে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানেই কাব্যগ্রন্থটির বিশেষ মূল্য ও মর্যাদা। ভাব সম্পদ ও শিল্প নির্মিতি উভয় দিক থেকেই কাব্যগ্রন্থটি ঋদ্ধ।

ভাবলোক

এ কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায়ই চিত্তরঞ্জন দাশের ব্যক্তিস্বরূপ এবং তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত কবির শোক ও শ্রদ্ধা অভিব্যক্ত হয়েছে। ভাব-সম্পদের দিক থেকে সবগুলো

কবিতাই প্রায় সমধর্মী, বিভিন্ন কবিতায় যে খণ্ড-ক্ষুদ্র ভাবের প্রকাশ ঘটেছে, তা সম্পূর্ণাংগ রূপ লাভ করেছে 'ইন্দ্র-পতন' কবিতায়।

চিত্তরঞ্জন দাশের চরিত্রের প্রধান গুণ হলো মানুষের জন্যে আত্মত্যাগ স্বীকার করা। 'অর্ঘ্য' কবিতায় কবি তাঁকে 'চির ভোলা' অভিহিত করে এবং 'নীলকণ্ঠে'র প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন ,

হায় চির ভোলা হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া,
ফিরিয়া এলে যে নীল কণ্ঠের
মৃত্যু গরল পিয়া।

এই ধরণীর ধূলি-মাটি মানুষকে ভালোবেসেছেন বলে দেবতারা তাঁকে সসম্মানে স্বর্গে তুলে নিলেন।

তাঁর অকাল প্রয়াণে যেন 'প্রভাতেই সন্ধ্যা হলো, দুপুরেই সূর্য ডুবলো'— এ অবস্থাকে কবি 'অকাল সন্ধ্যা' বলে অভিহিত করেছেন। এর ফলে চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার নেমে এলো, উঠলো ক্রন্দনের ঝড়-তুফান। মানুষের মঙ্গলের জন্যে তিনি নিজের দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন, কারাগারে গিয়েছেন, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। সবারে সুধা বিলিয়ে নিজে নিলেন মৃত্যু-ক্ষুধা, সবারে কুসুম দিয়ে নিজে নিলেন খঞ্জর ঃ

সবারে বিলায়ে সুধা
সে নিল মৃত্যু ক্ষুধা,
কুসুম ফেলে নিল খঞ্জর গো।

এ যেন অবিকাল নীলকণ্ঠ বা শিব। শুধু তাই নয়, আত্মত্যাগে ও অপশক্তি দমনে তিনি শিবভক্ত দধীচির মতো। দধীচির অস্থি নির্মিত বজ্রেও দেবতারা অসুর ও অসুন্দরকে নাশ করে দিয়েছেন। 'অকাল সন্ধা' কবিতায় এভাবে চিত্তরঞ্জনের মানবসেবা ও আত্মত্যাগের স্বরূপ প্রকৃতি সমুদঘাটিত হয়েছে। 'রাজ-ভিখারী' কবিতায় দেখা যায় নিজের ভিক্ষাপূর্ণ প্রাণ বিলিয়ে দেবার জন্যে তিনি বৈরাগী বা যোগী বেশে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুতে 'অকাল সন্ধা' নেমে এলো ও শোকবিহ্বল কবি 'সান্ত্বনা' কবিতায় সান্ত্বনাও খুঁজে পেয়েছেন এই বলে যে, কালের প্রয়োজনে তাঁর পুনর্জন্ম হবে। তাঁর

এ মৃত্যু সাধারণ মানুষের মতো মৃত্যু নয় - কর্মে বিরতি মাত্র। তিনি মেহেদী বা ঈশার মতো পুনরুত্থিত হবেন ; এ বিশ্বাস অন্তরে পুষছেন কবি।

চিত্ত চিতায় ছাই মেখে শিব সৃষ্টি বিষাণ ঐ বাজায়,

জন্ম নেবে মেহেদী-ঈশা ধরার বিপুল এই ব্যথায়।

তাঁর এ বিশ্বাসের কারণও কবি ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, তিনি পুনর্জন্ম না নিলে মৃত্যুতে এভাবে হাসতেন না এবং পৃথিবীকেও এভাবে ভালোবাসতেন না। এখানে কবি মূলত একথা ইংগিত করতে চেয়েছেন যে, অনাগত ভবিষ্যতে প্রয়োজনে দেশে চিত্তরঞ্জনের নীতি-আদর্শের মহাপুরুষ জন্ম নেবেন, যিনি হবেন চিত্তরঞ্জনের অবিকল প্রতিমূর্তি। 'ইন্দ্র-পতন' কবিতায় কবি চিত্তরঞ্জন দাশকে দেবরাজ ইন্দ্রের সংগে তুলনা করেছেন এবং সে সূত্রে বলেছেন, 'ধরার ইন্দ্র' বা 'মর্ত্যের ইন্দ্র'। তাঁর মৃত্যুকে এ মর্ত্যের ইন্দ্র-পতন বলে অভিহিত করেছেন। এ ইন্দ্র মর্ত্য থেকে গিয়ে স্বর্গে বসবে - স্বর্গের ইন্দ্রের সংগে। এ যেন কবি বা বাঙালির গর্বের বিষয় - আনন্দের বিষয়ও,

মর্ত্য ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ ইন্দ্র কাছে।

মর্ত্যের ইন্দ্রের বিদায়ে মর্ত্যলোকে শোক ও আনন্দ যুগপৎ লক্ষ্য করা যায়। শোক এ কারণে যে, মর্ত্যের ইন্দ্র মর্ত্যবাসীদের থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছে, আনন্দ এ কারণে যে, মর্ত্যের ইন্দ্র স্বর্গে যাচ্ছেন। এ আনন্দ-বেদনার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে এভাবে,

কাঁদিছে ধরার তরু লতা পাতা, কাঁদিছে পশু পাখি,

ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি'।

বাজে আনন্দ মৃদঙ্গ গগণে, তড়িৎ-কুমারী নাচে,

মর্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ-ইন্দ্র কাছে।

তাঁর মৃত্যুতে শুধু মানুষই নয়, পশু পাখি তরু লতা তথা পুরো প্রকৃতিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মানুষের হৃদয় আসন ছেড়ে তিনি মৃত্যুর মাধ্যমে স্বর্গে চলেছেন, তাই শোকের মাঝেও কবি সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন।

কাঁটার মৃণালে পদ্ম ফোটার মতো চিত্তরঞ্জন ফুটে উঠেছিলেন তাঁর উজ্জ্বলতা নিয়ে। কিন্তু মৃত্যু পূজারী তাঁকে সম্ভ্রমে নতশিরে ছিঁড়ে নিলো দেবতার পদতলে শ্রেষ্ঠ

অর্ঘ্য দেবার জন্যে। তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবীতে যে শূন্যতা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে কবি সে পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন পুরানের আশ্রয়ে,

দুলিছে বাসুকী মণিহারা ফণী, দুলে সাথে বসুমতী,
তাহার ফণার দিনমণি আজ কোন্ গ্রহে দেবে জ্যোতি।

তিনি ছিলেন সংস্কারক, মহাবিদ্রোহী - অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। গোলকের নিদ্রিত বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করে ভৃগু তাঁকে যেমন জাগিয়ে তুলেছেন ঠিক তেমনি আমাদের সমাজে জাগরণ ঘটিয়েছেন চিত্তরঞ্জন,

যখনি স্রষ্টা করিয়াছে ভুল, করেছ সংস্কার,
তোমারি অগ্রে স্রষ্টা তোমারে করেছে নমস্কার।
ভৃগুর মতন যখনি দেখেছ অচেতন নারায়ণ,
পদাঘাতে তাঁর এনেছ চেতনা, কেঁপেছে জগজ্জন।

তাঁর মৃত্যুতে কবির মনে জাগে তাঁর অপরূপ সৃষ্টি–কাহিনী, অর্থাৎ তাঁর কবিতা ও সংগীতের কথা কবির মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঁর আত্মত্যাগের কথা। সৃষ্টিধর্মে ও ত্যাগধর্মে তিনি নিজকে মহিমান্বিত করতে পেরেছেন। বিভিন্ন উৎস থেকে তিনি উপাদান নিয়ে নিজকে নির্মাণ করেছেন : তাঁকে লক্ষ্মী দিয়েছেন সোনার পাপড়ি, বীণা দিয়েছেন বাণী, শিব দিয়েছেন ত্যাগের বিভূতি, বিষ্ণু দিয়েছেন ভাংগনের গদা, যশোদা–দুলাল দিয়েছেন বাঁশি, ভাস্কর দিয়েছেন অমিত তেজ, মৃগাঙ্ক দিয়েছেন হাসি, ভারত–জননী দিয়েছেন গৌরিক চীর, প্রতাপ–শিবাজী দিয়েছেন মন্ত্র, বুদ্ধ দিয়েছেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিয়েছেন ঝুলি, বেদতারা দিয়েছেন মন্দার মালা এবং মানব দিয়েছেন ধূলি। এর ফলে তিনি হতে পেরেছেন 'মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী' এবং 'হিমালয় হতে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হতে'।

এ মহাপুরুষের সম্মুখ থেকে প্রবল বাধাও তৃণসম ভেসে যেতো। জ্ঞানে ও গুণে, কর্মে ও নৈপুণ্যে, ত্যাগে ও সাহসে তিনি যথার্থই দেশের নায়ক 'দেশবন্ধু' ছিলেন। তিনি ভারতের হলেও তাঁর অবদানে বিশ্ব মানবসমাজ উপকৃত হয়েছে, তাই তাঁর মৃত্যু বিশ্বের জন্যও দুর্দিন বলে কবির মনে হয়েছে,

আজ ভারতের ইন্দ্র–পতন, বিশ্বের দুর্দিন,

তিনি ছিলেন 'দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু, মানব–বন্ধু'। তাই বিশ্ব আজ শ্রদ্ধায় নমিত তাঁর চরণ তলে। কবি আবেগঘন ভাষায় তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

দীনের বন্ধু, দেশের বন্ধু, মানব-বন্ধু তুমি,
চেয়ে দেখ আজ লুটায় বিশ্ব তোমার চরণ চুমি'।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে কবি এমনই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন যে, তাঁকে তিনি পয়গম্বর বা অবতার বা দেবতা বা ফেরেস্তার সংগে তুলনা করতেও দ্বিধা করেননি। ত্যাগে, কর্মে, ঐশ্বর্যে ও ঔদার্যে তাঁর মনে হয়েছে চিত্তরঞ্জন ঐ স্তরের একজন। সুতরাং কবি পয়গম্বর বা অবতার যুগে না জন্মালেও তাঁর আফসোস্ নেই। কারণ তিনি দেখেছেন সেই স্তরেরই একজনকে – চিত্তরঞ্জনকে। কিন্তু তাঁকে না জানতে বা না বুঝতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন এটাই কবির দুঃখ।

চিত্তরঞ্জন ত্যাগে বুদ্ধের মতো, সন্ন্যাসে-প্রেমে নিমাইয়ের মতো। সুতরাং বুদ্ধ বা নিমাইকে না দেখলেও কবির আফসোস্ নেই। কারণ কবি দেখেছেন তাঁদের স্তরের মানব দেবতুল্য চিত্তরঞ্জনকে।

পয়গম্বর ও অবতার যুগে জন্মিনি মোরা কেহ,
দেখিনি ক' মোরা তাঁদের, দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেহ। ....
বুদ্ধের ত্যাগ শুনেছি মহান, দেখিনি ক' চোখে তাহে,
নাহি আফসোস, দেখেছি আমরা ত্যাগের শাহানশাহে।
নিমাই লইল সন্ন্যাস প্রেমে, দিইনি ক' তারে ভেট,
দেখিয়াছি মোরা "রাজা সন্ন্যাসী" প্রেমের জগৎ-শেঠ।

তাঁর আত্মত্যাগের স্বরূপ তুলে ধরার জন্যে কবি তাঁকে এ কবিতায় দধীচির সংগে তুলনা করেছেন,

শুনি, পরার্থে প্রাণ দিয়া দিল অস্থি বনের ঋষি,
হিমালয় জানে, দেখেছি দধীচি গৃহে বসে দিবানিশি।

একই সংগে দানে ও ত্যাগে তিনি হরিশ্চন্দ্র, কর্ণ ও ইব্রাহীম সমতুল্য। রাজ-কূল-মান-পুত্র পত্নী বিসর্জন দিয়ে তিনি মানুষের সেবায় আত্মত্যাগ করেছেন। অভাব গ্রস্তকে দান করেছেন মুক্ত হস্তে,

তব ভাণ্ডার-লক্ষ্মীরে রাজা নিজ হাতে দিলে তুলি,
ক্ষুধা-তৃষাতুর মানবের মুখে, নিজে নিলে পথ-ধূলি।
হেম লক্ষ্মীর তোমারও জীবন-যজ্ঞে ছিল প্রয়োজন,

পুড়িলে যজ্ঞে, তবু নিলে নাক' দিলে যা বিসর্জন।

এমন পরার্থে আত্মদান ও ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর ছিলেন চিত্তরঞ্জন। তাই তাঁকে ফেরেশতারা জানান সালাম, দেবতারা নোয়ান শির, ব্রাহ্মণ জানান নমস্কার এবং সর্বোপরি এ মহামানবের জন্যে আসন পেতে রেখেছেন বুকে স্বয়ং ঈশ্বর। এভাবে কবি চিত্তরঞ্জনের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন।

তাঁর বীরত্বের পরিচয় দেবার জন্যে কবি তাঁকে 'ভীম', 'নৃসিংহ' ও 'প্রহ্লাদ' বলে অভিহিত করেছেন। ভীম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অসীম বীরত্বে শত্রু পক্ষের মোকাবেলা করেছেন, বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহ অর্ধ নর ও অর্ধ সিংহ রূপে অত্যাচারী অসুররাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছেন, বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে বারংবার চেষ্টা করেও হিরণ্যকশিপু বধ করতে পারেনি। চিত্তরঞ্জন দাশও তাঁদের মতোই অত্যাচারী শক্তির মোকাবেলা করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে কবি তাঁর সংগ্রামী মূর্তি স্মরণ করেছেন।

আসিলে সহসা অত্যাচারীর প্রাসাদ-স্তম্ভ টুটি',
নব নৃসিংহ অবতার তুমি, পড়িল বক্ষে লুটি।
আর্ত মানব-হৃদি-প্রহ্লাদ, পাগল মুক্তি প্রেমে,
তুমি এসেছিলে জীবন-গঙ্গা তৃষাতুর তরে নেমে।

বেদব্যাসের 'মহাভারতে'র মতো চিত্তরঞ্জনের জীবনও ছিলো সংগ্রামমুখর। সেই সংগ্রাম ছিলো ন্যায়শক্তির সংগে অপশক্তির সংগ্রাম, সত্যের সংগে মিথ্যার সংগ্রাম এবং সর্বোপরি বৃহত্তর জনগণের মুক্তির সংগ্রাম। তাই তাঁর জীবনটাই হলো এক কাব্যের কাহিনী - এ কাহিনীর রচয়িতা তিনি স্বয়ং। তাই কবি তাঁকে 'নব বেদব্যাস' বলে অভিহিত করেছেন।

তাঁর মধ্যে ছিলো না কোনো ধর্মভেদ বা বর্ণভেদ। সবার জন্যে তাঁর দুয়ার উন্মুক্ত ছিলো। প্রকৃতির মতোই তিনি ছিলেন সেবা দানকারী। কবি প্রকৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ মথিত উপাদান-উপমার সাহায্যে তাঁর এ অসাধারণ অসাম্প্রদায়িক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

তোমারে দেখিয়া কাহারো হৃদয়ে জাগেনি ক' সন্দেহ,
হিন্দু কিংবা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ।
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি।
হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব।

উপমহাদেশের প্রধান দুই ধর্মসম্প্রদায়ের–হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি স্থাপনে ও পশ্চাৎপদ মুসলমানদের অগ্রগতির জন্যে তিনি প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালান। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফল হলো 'ন্যাশনাল বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩)। এ প্যাক্ট বা চুক্তি অনুসারে বাংলা প্রদেশের প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় সমানাধিকার ও নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম করার স্বাধীনতা পাবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই চুক্তি 'হিন্দু-মুসলমান মিলনের সেঁতু বন্ধ' বলে অভিহিত। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থান্বেষী ও উগ্রবাদীরা এ চুক্তির বিরোধিতা করে, বিশেষত হিন্দু উগ্রবাদীরা ছিলো এ চুক্তির ঘোর বিরোধী। এ জন্যে তারা চিত্তরঞ্জনকে নানা অপবাদ দেয়। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর মত-পথ-নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। কবি ইতিহাসের সেই অণু-স্মৃতি তুলে ধরেছেন এভাবে।

নিন্দা-গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল, মিলন-হেতু,
হিন্দু-মুসলমানের পরাণে তুমিই বাঁধিলে সেতু।

উল্লেখ্য যে, ১৯২২ সাল হতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ভারতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা সংঘটিত হয়। ছোট খাটো হাঙ্গামা বাদ দিলেও এসময় একশ' বারটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে এবং তাতে প্রায় চারশ' পঞ্চাশ জন লোক নিহত ও পাঁচ হাজার লোক আহত হয়। সেসব দাঙ্গা প্রতিরোধে মহাত্মা গান্ধী চিত্তরঞ্জন দাশ, মাওলানা শওকত আলী (১৮৭৩-১৯৩৮), মাওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১) মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮), আবদুর রসুল (১৮৭২-১৯১৭) মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৭-১৯৭৩) ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ স্ব স্ব অবস্থান থেকে প্রচেষ্টা চালান। তাঁদের প্রচেষ্টা ধুলিসাৎ করে দিতে উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থান্বেষী বা উগ্রবাদীরা ছিলো সদা তৎপর। এমন দুর্যোগ মুহূর্তে চিত্তরঞ্জনের অকাল মৃতু বেদনা, হতাশা ও শূন্যতা সৃষ্টি করে। তাঁর অবর্তমানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও স্বরাজ আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে যেন কুরুক্ষেত্রে শত্রু পক্ষের বিজয় উল্লাস শুরু হয়।

যে দিকে তাকাই কূল নাহি পাই, অকূল হতাশ্বাস,
কোন্ শাপে ধরা স্বরাজ রথের চক্র করিল গ্রাস।
যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে রণে পড়িল সব্যসাচী,
ঐ হের, দূরে কৌরব-সেনা উল্লাসে উঠে নাচি'।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে (১৯২৬) উগ্র হিন্দুদের চাপে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল ঘোষণা করা হয়।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্তের যে আশঙ্কা করেছেন তা অল্প কালের মধ্যে সত্যে পরিণত হলো। কবি আবেগে-উচ্ছ্বাসে চিত্তরঞ্জনকে স্মরণ করেছেন ; তাঁর অবদান তুলে ধরেছেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

তিনি দেশের জন্যে সর্বত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন, দেশের জন্যে উৎসর্গীকৃত ছিলো তাঁর প্রাণ। দেশপ্রেমে তিনি ছিলেন তুলনা-বিরল। নজরুল তাঁর 'পোলিটিকাল তুবড়িবাজী' নিবন্ধে তাঁর চরিত্রের এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, "বৎসরান্তে কানপুরে আমাদের পোলিটিকাল চড়কপূজা শেষ হলো। ফিরে এসে দুই একজন বাদে নেতারা ওকালতি, ডাক্তারী, ব্যারিষ্টারী ও অন্যান্য ব্যবসায় মন দিলেন এবং যিনি বড় দয়ালু তিনি সপ্তাহান্তে হয়ত এক একবার দেশ-উদ্ধারে মনোযোগ দিবেন। কই দেশবন্ধুর মত সেই সর্বগ্রাসী দেশপ্রেম, কই সেই জ্বালা?" (লাঙল, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ৭ই জুনয়ারি, ১৯২৬ : ৫)।

পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন দাশের চতুর্থ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে রচিত তাঁর 'তর্পণ' (সন্ধ্যা ; ১৯২৯) কবিতায়ও এ কাব্যগ্রন্থের ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে তিনি চিত্তরঞ্জনের বিপ্লবী রাজনৈতিক জীবনাদর্শের দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন।

শিল্পরূপ

বক্তব্যকে আশ্রয় করে শিল্পরূপ লাভ করে। কবিতার ক্ষেত্রে শিল্পরূপ বিচারে ছন্দ, শব্দ, রস, উপমা, অলঙ্কার প্রভৃতি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ অনেকগুলো উপাদানের সমবায়ে শিল্পরূপ মূর্তি লাভ করে। সেই শিল্পের আধারে স্থাপিত হয় কবির বক্তব্য। তাই কবিকে শিল্পের ব্যাপারে সচেতন থেকে কবিতা লিখতে হয়। কবিতার মূল মুল্য শিল্পেই নিহিত। এবং সে কারণে শিল্পোত্তীর্ণ কবিতাই কালোত্তীর্ণ, এমন কি দেশোত্তীর্ণও। প্রতিভাবান কবির সৃষ্টিতে কবিতা হয়ে ওঠে রূপের প্রকাশ, নজরুলের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। নজরুল সমকালীন অতি সাম্প্রতিক বিষয়কেও কবিতার উপজীব্য বিষয় করতে পারতেন। তিনি তাঁর প্রিয় নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের অকাল মৃত্যুতে শোকবিহ্বল চিত্তে 'চিত্তনামা' কাব্য গ্রন্থটি রচনা করেন। শোকে বিপর্যস্ত থেকেও তিনি কাব্যরচনায় শিল্প সতর্ক থেকেছেন। অবশ্য কয়েকটি স্থানে অতি আবেগ-উচ্ছ্বাসে শিল্পরস কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিন্তু এসব স্থানেও তাঁর লক্ষ্য সিদ্ধ হয়েছে।

মাত্রা ও পর্ব

এ কাব্যগ্রন্থের তিনটি কবিতার দুটিই ('অর্ঘ্য' ও 'ইন্দ্র-পতন') মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। বাকি কবিতাটি ('সান্ত্বনা') অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রত্যেকটি কবিতা মাত্রা ও পর্ব বিন্যাসে পরস্পর পৃথক। এর ফলে কবিতার পাঠে একঘেঁয়েমি দূর হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন স্বাদের সৃষ্টি হয়েছে। কাব্যগ্রন্থটি শোকভাবের, শোকরসের। এ ভাব বা রসের শ্রেষ্ঠ বাহনই হলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। সীমিত পরিসরে এ ছন্দের ব্যবহারে কবি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'অর্ঘ্য' ও 'ইন্দ্র-পতন' কবিতাদ্বয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত হলেও পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে পৃথক। 'অর্ঘ্য' কবিতায় প্রতিটি চরণ ভেঙে দুটি পঙ্‌ক্তি করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম পঙ্‌ক্তি দুটি পূর্ণ পর্ব ও প্রতি পর্ব ছয় মাত্রাবিশিষ্ট। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি একটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব এবং পূর্ণ পর্বটি ছয় মাত্রা ও অপূর্ণ পর্বটি দু' মাত্রাবিশিষ্ট। 'ইন্দ্র-পতন' কবিতায় প্রতিটি পঙ্‌ক্তি বা চরণ তিনটি পূর্ণ পর্বে ও একটি অপূর্ণ পর্বে গঠিত এবং পূর্ণ পর্ব ছয় মাত্রা ও অপূর্ণ পর্ব দু' মাত্রাবিশিষ্ট। অন্য দিকে ছয় স্তবকে বিভক্ত 'সান্ত্বনা' কবিতায় প্রতি পূর্ণ পর্ব চার মাত্রা বিশিষ্ট এবং তিনটি পূর্ণ পর্বের পর একটি তিন মাত্রার অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। প্রতি ভাগে মোট ছয়টি পঙ্‌ক্তি বা চরণ আছে। তন্মধ্যে মধ্যের পঙ্‌ক্তি দুটোর প্রত্যেকটি সমমাত্রিক এবং দু' পর্বে বিভক্ত। অর্থাৎ এর মাত্রা ও পর্ববিন্যাস এরকম : ৪ । ৪ । ৪ । ৩ এবং ৪ । ৪

গঠনকৌশলের দিক থেকে এটি সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা বলে দাবি করতে পারে। এ তিনটি কবিতা ছাড়া বাকি দুটি 'অকাল-সন্ধ্যা' ও 'রাজ-ভিখারী' গান। সুতরাং সেগুলোর ক্ষেত্রে কবিতার ছন্দ্র বিচার প্রযোজ্য নয়।

অলঙ্কার

অলঙ্কার কবিতার অনিবার্য উপাদান। তাই বলা যায়, অলঙ্কার ঝঙ্কৃত বাক্যই কবিতা। কাব্যের শরীরে অনেক সময় অলঙ্কার এমনভাবে মিশে থাকে যে, তা দেখা যায় না। অলঙ্কারগুলোর মধ্যে অনুপ্রাসই প্রদান। অন্য অলঙ্কার না থেকে যদি শুধু অনুপ্রাস অলঙ্কারই থাকে তা হলে তা কাব্য বলে গণ্য হতে পারে। এ অনুপ্রাস আবার চার প্রকার : অন্ত্যানুপ্রাস বৃত্তানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস ও শ্রুত্যানুপ্রাস এই চার প্রকার অনুপ্রাসই 'চিত্তনামা' কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য অলঙ্কারও কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়েছে। নিচে 'চিত্তনামা' কাব্যে ব্যবহৃত প্রধান অলঙ্কারের উল্লেখ করা হলো।

অন্ত্যানুপ্রাস ঃ এ কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতা ও গানে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সর্বক্ষেত্রে ঐ অন্ত্যানুপ্রাসের মিল একরম নয়। 'অর্ঘ্য' কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাসের কক/খখ/ রীতি, 'সান্ত্বনা' কবিতায় কক/খখ/কক রীতি ও 'ইন্দ্র-পতন' কবিতায় কক/খখ রীতি এবং 'অকাল-সন্ধ্যা' গানে কক/খ/কক/খ রীতি 'রাজ-ভিখারী' গানে প্রথম স্তবকে ও পরবর্তী প্রত্যেক স্তবকে খখ/ককক রীতি অনুসৃত হয়েছে। কবির সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার ও শব্দ বা ধ্বনি শোনার সতর্ক কান-এ দুয়ের ওপরই অন্ত্যানুপ্রাস প্রয়োগ সাফল্য নির্ভর করে :

১। কেন এত ভালো বেসেছিলে তুমি
এই ধরণরি ধূলি ?

দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে
স্বর্গে লইল তুলি'। - অর্ঘ্য

২। আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে।

তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে। - ইন্দ্র-পতন

বৃত্ত্যনুপ্রাস ঃ

১. হায় চির-ভোলা, হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া, - অর্ঘ্য

২ জীবন-বেড়ার আড়াল ছাপি বুকে সুবাস টুটল গো। - সান্ত্বনা

৩. শোকের নিশির শিশির ঝরে
ফলবে ফসল ঘরে ঘরে। -ঐ

৪. অম্বরে ঘন ডম্বরু ধ্বনি গুরু গুরু গুরু গুরু - ইন্দ্র-পতন

৬. খুলিল না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী। - রাজ-ভিখারী

ছেকানুপ্রাস

১. শোকের নিশির শিশির ঝরে, - সান্ত্বনা

২. হায় অসহায় সর্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা, - ইন্দ্র-পতন

৩. বক্ষের বাণী চক্ষের জলে ধুয়ে যায়, নাহি ফোটে। - ঐ

৪. ফেরে পথে ক্ষুধাতুর সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি। – রাজ-ভিখারী

শ্রুত্যনুপ্রাস

১. হয়ত এবার মিলন রাসে
বংশীধারী আসবে পাশে। – সান্ত্বনা

২. বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ মন্দুরা-মাঝে
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে। – ইন্দ্র-পতন

৩. আজি দিকে দিকে বিপ্লব-অহি দল খুঁজে ফেরে ডেরা,
তুমি ছিলে নাগ-শিশুদের ফণি মনসার বেড়া। – ঐ

শ্লেষ

১. আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন ইন্দ্রের আগমনী? – ইন্দ্র-পতন

২. শয়তানও আজ দেবতার নামে করিছে নান্দী পাঠ। – ঐ

কাকুবক্রোক্তি

১. কেন এত ভালসেছিলে তুমি
এ ধরণীর ধুলি? – অর্ঘ্য

২. হেথা কি নাচ্‌বে না শঙ্কর গো।। – অকাল-সন্ধ্যা

৩. শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর, পুষ্প হরিৎ-পাতা? – ইন্দ্র-পতন

৪. তোর বুকে কি মা চির অতৃপ্ত রবে সন্তান-ক্ষুধা? – ঐ

উপমা-রূপক

উপমা-রূপকাদি অর্থাৎ উপমা ও তৎসঞ্জাত অলংকার যেমন রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, উল্লেখ, বিষম, বিরোধাভাস, সন্দেহ প্রভৃতি কবিতার কৌলিন্য বৃদ্ধি করে। কবির অভিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রাতিস্বিক দৃঢ়তা লাভ করে। অন্যান্য কাব্যের মতো 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থেও কবি উপমা-রূপকাদি ব্যবহার করেছেন নিজস্ব স্টাইলে। 'চিত্তনামা'র মতো বিষয়নির্ভর কাব্যেও তিনি উপমাদির প্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

উপমা

১. ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি'। – ইন্দ্র-পতন
৩. তপোবনে তুমি অর্জিলে তেজ বিশ্বামিত্র-সম – ঐ

মালোপমা

১ তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি। – ইন্দ্র-পতন

রূপক

১। নিখিল আঁখির ঝিনুক মাঝে,
অশ্রু-মানিক ঝলত না যে।
রোদের উনুন না নিবিলে চাঁদের সুধা গল্‌ত না,
গগন-লোকে আকাশ-বধূর সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলত না। – সান্ত্বনা
২। স্বরাজ-দলের চিত্ত-কমল লুটল বিশ্বরাজের পায়, – ঐ
৩। বাজে আনন্দ-মৃদঙ্গ গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে – ইন্দ্র-পতন
৪। জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে কেহ আনিবে অমৃত-বারি। – ঐ
৫। মোহ-ঘুমপুরী উঠিল শিহরি চমকিয়া ঘুম ভেঙে। – রাজ-ভিখারী

পরম্পরিত রূপক

১। না ঝর্‌লে তার প্রাণ- সাগরে মৃত্যু রাতের হিম-কণা
জীবন-শক্তি ব্যর্থ হত, মুক্তি-মুক্তা ফল্‌ত না। –সান্ত্বনা

উল্লেখ

১। হে মহাপুরুষ, মহাবিদ্রোহী, হে ঋষি, সোহম্‌-স্বামী। – ইন্দ্র-পতন
২। নিখিল-চিত্তরঞ্জন উদিলে নিখিল ছানি-
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী। – ঐ

বিরোধাভাস

১। প্রভাতেই সন্ধ্যা হল,
দুপুরেই ডুবল দিবাকর গো। – অকাল-সন্ধ্যা

২। মৃত্যু আজিকে হইল অমর পরশি তোমার প্রাণ
কালো মুখ তার হল আলোময়, শ্মশানে উঠিছে গান। – ইন্দ্র-পতন

সমাসোক্তি

১ আজ ভারতের ইন্দ্র-পতন বিশ্বের দুর্দিন,
পাষাণ বাঙ্‌লা পড়ে এক কোণে স্তব্ধ অশ্রুহীন। – ইন্দ্র-পতন

সন্দেহ

১ অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি?
হয়ত তাহাই, হয়ত নহে তা...... – ইন্দ্র-পতন

২. কি যে ছিলে তুমি, জানি না ক' কেহ, দেবতা কি আওলিয়া ; – ঐ

অতিশয়োক্তি

১. জন্ম নেবে মেহেদী ঈশা ধরার বিপুল এই ব্যথায় – সান্ত্বনা

২. তব ইঙ্গিতে দেখেছি সহসা সৃষ্টি গিয়াছে থামি'। – ইন্দ্র-পতন

৩. তোমারি অগ্রে স্রষ্টা তোমারে করেছে নমস্কার, – ঐ

পুরাণ

নজরুল ইসলাম পুরাণ প্রবিজ্ঞ কবি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'য় (১৯২২) তিনি পুরাণ সম্মৃদ্ধি ও পুরাণ প্রয়োগে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেখানে তিনি একই সংগে ও একই অনুষঙ্গে ভারতীয়, মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ ব্যবহার করেছেন। পুরাণ প্রয়োগে তাঁর কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি পুরাণের পুনর্নির্মাণ করেছেন। রূপক, উপমা, প্রতীক, ব্যঞ্জনা, কাব্য সৌন্দর্য ও উদ্দীপনা সৃষ্টির কাজে তাঁর কাব্যে পুরাণ ব্যবহৃত। 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থেও তিনি উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যেই বিশেষত চিত্তরঞ্জন দাশের কৃতিত্ব, মহত্ত, চরিত্র ও গুণ বর্ণনা বা নির্দেশনায় পুরাণের ব্যবহার করেছেন। এখানেই তিনি কম-বেশি তিন প্রকার পুরাণ ব্যবহার করেছেন :

(ক) ভারতীয় পুরাণ : ভোলা, নীলকণ্ঠ, শঙ্কর, বাসুদেব, যশোদা, শিব, ইন্দ্র,

কেশব, কমলা, নারায়ণ, বাসুকী, ভৃগু, লক্ষ্মী, বীণা, বিষ্ণু, অবতার, দধীচি, হরিশ্চন্দ্র, কর্ণ, রাম, সীতা, জানকী, বিশ্বামিত্র, ভীম, কল্কি, শচী, ব্যাস, নৃসিংহ, প্রহ্লাদ, অরিন্দম, ঐরাবত, যুধিষ্ঠির, সব্যসাচী, ধুর্জটি, দনুজ-দলনী।

(খ) মধ্যপ্রাচ্য পুরাণ : পয়গম্বর, ইব্রাহিম, নবী, ফেরেশতা, মেহেদী।

(গ) পাশ্চাত্য পুরাণ : ঈশা।

এসব পুরাণ ও একই সংগে পুরাণচূর্ণ বা পুরাণ প্রসংগের অবতারণায় তাঁর বক্তব্য হয়েছে স্পষ্ট, লক্ষ্যভেদী। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কবিতাংশ পুরাণ ভারাক্রান্ত ; তাঁতে তাঁর কাব্য সৌন্দর্য ব্যাহত হয়েছে বলা যায়। চিত্তরঞ্জনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাণের বাহুল্য প্রয়োগ ঘটেছে। এটা একই সংগে দোষ ও গুণ। দোষ এ কারণে যে, তাতে কাব্যের সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে ; গুণ এ কারণে যে, তাতে চিত্তরঞ্জনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হয়েছে - যা ছিলো কবির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। এ কাব্যে পুরাণ, পুরাণচূর্ণ ও পুরাণ প্রসংগের কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হল :

১। মৃত্যু-বাসুদেবের কোলে কারার কেশব ঐ গো যায়
অনাগত বৃন্দাবনে মা যশোদা শাঁখ বাজায়। -সান্ত্বনা

২। চিত্ত চিতার ছাই মেখে শিব সৃষ্টি বিষাণ ঐ বাজায়,
জন্ম নেবে মেহেদী ঈশা ধরার বিপুল এই ব্যথায়। - ঐ

৩। ভৃগুর মতন যখনি দেখেছ অচেতন নারায়ণ,
পদাঘাতে তাঁর এনেছ চেতনা, জেগেছে জগজ্জন। - ইন্দ্র-পতন

৪। লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি'।
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশি,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি। - ঐ

ইতিহাস

এ কাব্যে পুরাণের মতো ইতিহাস প্রসংগের বা ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের সংগ্রামশীলতা ও অসাম্প্রদায়িক রূপ সফল ভাবে উন্মোচিত হয়েছে। কবি চিত্তরঞ্জনকে সংগ্রামশীলতার জন্যে প্রতাপাদিত্যের ও শিবাজীর (১৬২৭-৮০),

অসাম্প্রদায়িক চেতনার জন্যে আকবরের (১৫৫৬–১৬০৫), এবং ধর্মপ্রাণতার জন্যে আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮–১৭০৭) সংগে তুলনা করেছেন,

প্রতাপ-শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি'।

এবং হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংগজিব।

নজরুলের এ ইতিহাস সচেতনতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি চিত্তরঞ্জনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে অধিকরতর কার্যকরী হয়েছে।

ক্রিয়াপদ

অন্যান্য কাব্য গ্রন্থের ন্যায় 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থেও তিনি যুগপৎ সাধু ও চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। সেকালের কবিতায় সাধু ও চলতি ক্রিয়াপদের একত্রে প্রয়োগ রীতি সিদ্ধ ছিলো। কবিতার শিল্পগুণ ও শ্রুতি মাধুর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি বর্ণলোপ করে সাধু ও চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন এবং বর্ণলোপ নির্দেশ করার জন্য উর্ধ কমা দিয়েছেন।

উপসংহার

'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই আবেগে-উচ্ছাসে ভরপুর। কবি চিত্তরঞ্জনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। স্বতঃস্ফূর্ততা সত্ত্বেও ছন্দ, শব্দ ও উপমা-রূপকাদি সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ সচেতন। এজাতীয় কাব্যে আবেগের আতিশয্য স্বাভাবিক। এ আতিশয্য গুণেই কাব্যটি পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। ভাব সম্পদে ও শিল্পগুণে 'চিত্তনামা' নজরুলের অসামান্য সৃষ্টি।

টীকা

১। অসহযোগ আন্দোলন চলা কালে যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরী চৌরা থানার অধিবাসীরা উক্ত থানা আক্রমণ করে ও অগ্নি সংযোগ করে (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩)। এতে দারোগাসহ ২১ জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। ভারতের অন্যান্য স্থানেও অসহযোগীরা হিংস্র কার্যকলাপ শুরু করে।

২। এই চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাবে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানাদিতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ৬০% ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ৪০% আসন পাবে, সরকারি অফিসে মুসলমানদের ৫০% চাকরি

সংরক্ষিত থাকবে – অবশ্য ঐ পর্যায়ে না পৌছানো পর্যন্ত মুসলমানরা ৮০% চাকরি পেতে থাকবে। কোন ধর্মীয় আইন পাস করতে গেলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ৩/৪ সমর্থন দরকার হবে, কোনো মসজিদের পাশে গান বাজনা করা যাবে না এবং গো-জবাই ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল কাদির (সম্পাদিত), ১৯৯৩ : *নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড ও ৪র্থ খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বন্দে আলী মিয়া, ১৯৭১ : *জীবন শিল্পী নজরুল*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ১৯৮৩ : *সমকালে নজরুল ইসলাম*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ;

রফিকুল ইসলাম, ১৯৬৯ : *নজরুল নির্দেশিকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১১৯১, *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবনী ও সাহিত্য*, কে. পি. বাগচী এণ্ড কোং, কলকাতা

রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৭৫ : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, জেনারেল, কলকাতা

সুধীর কুমার মৈত্র, ১৯৯২ : *পত্র-পত্রিকার আলোকে নজরুল*, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা

পত্রিকা

কাজী নজরুল ইসলাম (পরিচালিত), ১৯২৬ : *লাঙল*, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ৭ জানুয়ারি বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল, কলকাতা